০৩-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - অপরের বিষয়ে চিন্তন করা ত্যাগ করে, নিজের কল্যাণে ব্যস্ত থাকো। নিজেকে খাঁটি সোনার মতন তৈরী করে, অন্যদেরকেও সে পথের দিশা দেখাও"

প্রশ্ন :- অশরীরী ভাবে আসার অভ্যাসে যে সদা ব্যস্ত থাকে, তার প্রধান লক্ষ্মণগুলি কি কি ?

উত্তর :- সে কখনও হঠ্ -যোগের সাহায্যে নিজের কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনার চেষ্টা করে না। অথচ, স্বাভাবিক রীতিতেই তার কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলি শীতল ও শান্ত থাকে। আমরা আত্মারা সবাই ভাই-ভাই স্বরূপ, এই স্মৃতি স্বাভাবিক ভাবে সর্বদাই সজাগ থাকে। দেহ-অভিমান ভাব থেকে নিস্তার পায়। নিজের নাম-রূপের মোহ থেকেও মুক্ত হয়ে যায়। তাই তো অন্যের বিষয়ে চিন্তাই আসে না।

গীত :- তু প্যার কা সাগর হ্যায় ....(হে পরমাত্মা, তুমি যে প্রেমের সাগর .)

ওঁম্ শান্তি! এই পরমাত্মা কেবল প্রেমের সাগরই নন, ইনি আবার জ্ঞানেরও সাগর। 'জ্ঞান' আর 'অজ্ঞান'। জ্ঞানকে বলা হয় দিন আর অজ্ঞানকে রাত। এই কারনেই জ্ঞান শব্দটিকে যেমন ভালো লাগে - অজ্ঞান শব্দটিকে ততটাই খারাপ লাগে। অর্দ্ধেক কল্প ধরে চলে এই জ্ঞানের প্রালব্ধ, যার দ্বারা সুখ-শান্তির প্রাপ্তি ঘটে। বাকী অর্দ্ধেক কল্পে চলে অজ্ঞানতার প্রালব্ধ, যার কারণে কেবল দুঃখই পাই আমরা। যদিও এ তো খুবই সহজ কথা, দিনের অর্থ হলো জ্ঞান আর অজ্ঞানের অর্থ রাত। কিন্তু সাধারণেরা এই সহজ সত্যতাই সহজে তা বুঝতে পারে না। জ্ঞান কাকে বলে আর অজ্ঞান বা কাকে বলে। আসলে এগুলি তো বর্তমানের এই জগৎ-সংসারের বাইরের কথা। তাই তোমাদেরকে এই ভাবেই বোঝাতে হয়। জ্ঞান আর ভক্তি কাকে বলে ? এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা পূজ্য হতে পারো। আর পূজ্য-রূপ হলেই, পূজার সামগ্রীর ধারণাটাও তখন এসে যায়- যেগুলি মন্দিরে বা পূজাস্থানে পালন করা হয়। সেগুলি এখনও তোমাদের স্মৃতিতে সুপ্ত হয়ে আছে। সেই পূজ্যদের জীবন-যাত্রার কাহিনীও তোমাদের স্মৃতিতে আছে। অথচ যারা পূজা করে, তাদের পূজা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানটাই যে নেই। পূজার অর্থ ভক্তি। যার মাধ্যমে ভক্তরা ভগবানের সাথে মিলিত হয়। ফলে ভক্তির ফলও পায় তারা। আর সেই ভগবান স্বয়ং এসেই তাদেরকে পূজারী থেকে পূজ্যে পরিণত করেন। একই আত্মা যে সত্যযুগে পূজ্য হয়, সেই আত্মাই কলিযুগে পূজারী হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা তা জানো। বর্তমান সময়ে তোমরা এখন কি অবস্থায় আছো আর ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছো। বিনাশ যেখানে অবসম্ভাবী, তা যে কোনও সময়েই হতে পারে। তার প্রস্তুতিও চলছে। এ তো জানাই আছে যে, প্রকৃতিতে অনেক প্রকারেরই দুর্দশা, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটতেই থাকবে। তাই এগুলি সেভাবে লিখেও দেওয়া উচিত। ঘরে ঘরে গৃহ-যুদ্ধ আর প্রকৃতিক দুর্যোগও ঘটতে থাকবে। কিন্তু, এগুলি কোনও ঈশ্বরীয় বিনাশ কার্য্য নয়। তা তো হবে অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের সময় অনুযায়ী। যখন বিশাল রূপে সেই প্রকৃতিক দুর্যোগ আসবে, তার দ্বারাই বিনাশ সম্ভব হবে। তখন অবিরাম ধারায় বৃষ্টি শুরু হবে। বিশাল আকারের ভূমিকম্প হতে থাকবে। খাদ্যের সংস্থানের অভাবে

মানুষের মৃত্যুর মিছিল হবে, চারিদিকে দুর্ভিক্ষ-মন্বমন্তর হবে। এই ভাবেই বিনাশ হতে থাকবে। আর সেটা তো বেশ ভালভাবেই তোমরা জানো -এসব যে অবশ্যই ঘটবে। তা না হলে, অতি কম সংখ্যক মনুষ্য দ্বারা সত্যযুগের সূচনাই বা হবে কিভাবে। তাই তো একসাথে অনেক কিছুরই বিনাশ হতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা তা খুব ভালভাবেই জানো যে, শরীর রূপী এই পোষাকের পরিবর্তনও তো হতেই হবে। যা হবে, এই জগৎ দুনিয়ার বাইরের বৃহৎ মেশিন-যন্ত্র দ্বারা। যাকে বলা হয় মুত পালীতি কাপড়া ধোয়ে- (পিতা পরমাত্মা তার সন্তানরূপী আত্মাদের ময়লা পরিস্কার করে পবিত্র বানান।) এখানে কাপড়ের অর্থ সেই কাপড়-চোপড় নয়, যা আমরা পরিধান করে থাকি। কাপড় অর্থে আমাদের এই বিনাশী শরীর। আর সেই শরীরের প্রকৃত মালিক -আত্মা। তাকেই যোগবলের দ্বারা পরিস্কার করতে হবে। বর্তমান সময়কালে ৫টি তত্বই একেবারে তমোপ্রধান অবস্থায় অবস্থায় রয়েছে। আর শরীর তো এই তত্ব থেকেই গঠিত হয়। তাই শরীরও সেই প্রকারেরই হয়। যখন পতিত পাবন বাবা এসে তাকে পবিত্র বানান, তারপরেই তা দূর হয়। আর তোমরা তা জানো যে, পবিত্রতা কিভাবে আসে। পদ্ধতিটাও খুব সহজ। কিন্তু, অন্যেরা তো তা বুঝতেই চায় না। যেখানে যেখানে ভক্তি-মার্গের যজ্ঞ ইত্যাদি হয়, সেখানে গিয়ে তাদেরকে তা বোঝানো উচিত যে, ভক্তি সহকারে যাদের পূজা-যজ্ঞ করো, তাদের কর্ম, কর্তব্য, গুন, জীবনী এগুলি জানতে পারলে তোমরাও দেবতায় পরিণত হতে পারো। ওঁনারা (দেবতারা) কিভাবে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন, তা বুঝতে পারলে, তেমরাও ওদের মতন জীবনমুক্তিতে আসতে পারো। মন্দিরে বসে তাদের (মূর্ত্তির) জীবনী-পঞ্জীকে বিশ্লষণ করে বোঝাতে পারলে, বেশ ভাল করেই তা বুঝতে সক্ষম হবে তারা। তোমরা এই বাবার কাছ থেকে তো সেই সব জীবনী-পঞ্জীই শুনে থাকো। তাই তো তোমরা বাচ্চারা আজ এত বুঝদার হতে পেরেছো। কিন্তু একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার জীবনী-পঞ্জী কেউ জানতে পারে না। সর্বত্র-সবকিছুতেই তার অবস্থান বললে কি আর তার বিষয়ে তা জানা সম্ভব ? কিন্তু তোমরা বাচ্চারা, এখন সেই পরম-পিতা পরমাত্মার জীবনী-পঞ্জীও জেনেছো - অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্তের ব্যাপারটাও জেনেছো। আর এই সঙ্গম সময়কেই আদি ধরবে। যেহেতু, এই সময়কালেই বাবা এসে পতিতদের পবিত্র পাবন বানিয়ে থাকেন। তারপর আবার কল্পের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ কল্পের মাঝামাঝি সময় থেকে ভক্তি-মার্গের খেলা শুরু হয়। সেটাই বাবা জানান, এই সঙ্গম সময়কালেই উনি এসে তা স্থাপন করেন ও করান। অর্থাৎ 'করন-করাবনহার' হন। কিন্তু কেবলমাত্র প্রেরণা দেওয়াকে, 'কিছু করা'- বলা যায় না। বাবা যা কিছু করান, তা বাচ্চাদের নিজেদের কর্ম-ইন্দ্রিয় দ্বারাই করান। তাই সেক্ষেত্রে, তাকে প্রেরণা বলা যায় না। যেহেতু তিনি করন-করাবনহার, তাই তিনি স্বয়ং তার উপস্থিতিতে তা করান। যা প্রেরণা দ্বারা সম্ভব হয় না। আত্মা ছাড়া শরীর কোনও কার্যই করতে পারে না। অনেকেই বলে থাকে, ঈশ্বরের প্রেরণাতেই সব কিছু হয়। তারা বলে, বাবা আপনি এমন প্রেরণা দেন, যাতে আমার স্বামীর বুদ্ধি-সুদ্ধি ঠিক হয়ে যায়। উত্তরে বাবা জানান- এটা প্রেরণার ব্যাপার নয়। আচ্ছা, শিব-জয়ন্তী কেন পালন করা হয় ? প্রেরণার দ্বারাই যদি কাজ হয়, তবে তো তেমাদের এখানে আসতেই হতো না। একেই তো তারা জানেই না যে, ঈশ্বর কি বা কে ? তাই তো এমনিতেই বলে দেয়, ঈশ্বরের প্ররণাতেই সব কিছুই হয়ে থাকে। যিনি নিরাকার, তিনি আবার প্রেরণা দেবেন কি ভাবে ? উনি তো করন-করাবনহার। উনি এই ধরায় অবতরণ করে দিশা দেখান মাত্র। অন্যের কর্ম-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মুরলী শোনান। যতক্ষণ না কর্ম-ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেন, ততক্ষণ পর্যন্ত্য মুরলীও শোনাতে পারেন না। যদিও উনি জ্ঞানের সাগর - তবুও মুরলী শোনাবার জন্য, ওনার কোনও মুখের আবশ্যকতা তো আছে। যার ফলে, এখন তোমরা বাচ্চারা সমস্ত দুনিয়ারই আদি-মধ্য-অন্তের -সম্পূর্ণ জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে এই বুদ্ধিটাও জন্মেছে, জ্ঞান ছাড়া কোনও গতি নেই।

এই জ্ঞান দিচ্ছেন কে ? অজ্ঞান-মার্গ আর জ্ঞান-মার্গের তফাৎটা একবার ভাবো। আবার বিজ্ঞানও তো আছে। অজ্ঞান হলো অন্ধকার। এছাড়া জ্ঞান আর বিজ্ঞানকে আমরা মুক্তি আর জীবন-মুক্তিও বলতে পারি। তোমাদের পবিত্র হবার জন্য, সেই জ্ঞানই এখন তোমরা পাচ্ছো। যার ফলে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারীও হতে পারো। এসব কথা যারা জানবে, তারাই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। একথা অবশ্যই ভাববে, আত্মাতে যখন জ্ঞান ধারন করে, তবে তার সাথে সংস্কারও নিয়ে যাবে অবশ্যই। মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হলে, সেই জ্ঞান তো অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু বাবা বোঝান, সেই প্রালব্ধের জন্য পুরুষার্থের দরকার অবশ্যই। প্রালব্ধ পাওয়া হয়ে গেলে, তারপর আর জ্ঞানের প্রয়োজনই বা কি? সত্যযুগ তো তোমাদের- প্রালব্ধ প্রাপ্ত বাচ্চাদের জন্যই। যা শুনেই আশ্চর্য্য হতে হয় বৈকি! এই জ্ঞান কিন্তু বংশ-পরম্পরায় চলতে থাকে না। বাবা তাই জানান, যেহেতু এই জ্ঞানের বেশীর ভাগটাই লোপ পেয়ে যায়। জ্ঞানের দিনের আলো প্রকাশ হলে, তখন তো আর অজ্ঞানতার অন্ধকার থাকেই না, অর্থাৎ জ্ঞানের আর প্রয়োজন পড়ে না। এটাও কিন্তু বুঝতে হবে। ঝট্ করে একথা অনেকেই বুঝতে পারে না। শিববাবা এই ভারত-খন্ডেই অবতরণ করেন, সাথে বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন - ভক্তির ফল দেবার উদ্দেশ্যে। ভক্তির পরে আসে সদ্গতি। এই মহা-বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী। আর তখন সবকিছুই অসাড় হয়ে থাকবে। তোমরা তা শুনতে থাকবে -সামান্য ফুলকির আগুন লাগলেই, এক-দুই ঘন্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ বাড়ী-ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর এই মহাবিনাশ তো কোনও নতুন কথা নয়- যা অবসম্ভাবী ভাবে হবেই হবে। সত্যযুগে তো অনেক কম সংখ্যক লোকের বাস থাকে পৃথিবীতে- যারা শ্রেষ্টাচারী স্বভাবের। অবশ্য শ্রেষ্টাচারী হতে গেলে, অনেক পুরুষার্থ করতে হয়- যা যথেষ্ট কষ্টসাধ্যও বটে। মায়া একেবারে নাকে দড়ি দিয়ে ধরার জন্য তৈরী থাকে। আর তাতেই যাদের পতন ঘটে, তারা ভীষণ আঘাতও পায়। তারপর সামলে উঠতে সময়ও অনেক লেগে যায়। সব চাইতে বেশী আঘাত প্রাপ্তি ঘটে, কাম-বিকারের কারণে। তাই তো কাম-বিকারকে মহাশত্রু বলা হয়। যা একেবারে পতিত-পাপী বানিয়ে ছাড়ে। বেশীর ভাগ ঝগড়ার কারণই এই কাম-বিকার। যে এই বিকারকে ছাড়তে পারবে না, তার জন্য নির্দ্দিষ্ট -এঁটো বাসন মাজা। বাড়ী-ঘর মোছা, ঝাঁট দেওয়া- এসব কাজ করেও তো পবিত্র থাকা যায়- যদিও তার জন্য মনের শক্তি আর বল দরকার। আবার কেউ যখন বাবার কাছে শরণ নেয়, তখন মায়া তার সাথে লড়াই শুরু করে দেয়। ফলে ৫ বিকারের রোগই একত্রে ফুলে ফেঁপে উথেল ওঠে। এর থেকে বাঁচতে হলে, প্রথমেই নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে। নিজেকে আত্মিক স্থিতিতে রাখতে হবে। জাগতিক দুনিয়াদারীর রীতি-নীতি থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে হবে। এমন হতে হবে যে, বর্তমানের কলিযুগী বিকারী দুনিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, এখন আমরা পরমধামের উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করেছি, অশরীরী হয়ে আপন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মাতে এই জ্ঞান হয়েছে যে, আমাদেরকে এক শরীর ছেড়ে, অন্য শরীর ধারণ করতে হয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই, আমাদেরকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থেকে সেই যাত্রায় নিজেকেও থাকতে হবে। বুদ্ধিতে এটা যেন সজাগ থাকে যে, বর্তমানের এই দুনিয়াটা একটা কবরের স্থান মাত্র। আমাকে তো সুখধামে যেতে হবে। তার জন্য আশীর্ব্বাদী বর্সা কিভাবে পাওয়া যাবে, বাবা আমাদেরকে সেই যুক্তিটাও বলে দেন। পবিত্র পাবন হবার জন্য আমরা যোগ অভ্যাস করি। এই যোগ বা স্মরণের যাত্রার দ্বারাই আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। তারপরেই আত্মা শরীর ছাড়ে। এই স্মরণের যাত্রা অতি রমণীয়। কেবল মাত্র বাবাকে আর নিজেদের রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে। এই সহজ কথাটাও কি তোমাদের মনে থাকে না। কেবলমাত্র আল্ফ (ভগবান)- কে স্মরণ করো, ব্যাস্, এইটুকুই। কিন্তু মায়া সেটাই করতে দেয় না। তাই এটা কষ্টসাধ্যও হয় বটে। আত্মারা তো এই জ্ঞান পেয়েছেই, আমাদের বাবা এসেছেন। আত্মাই তো এই

জ্ঞানের পাঠ পড়ে। আত্মাই জন্ম নেয়, শরীর ধারণের মাধ্যমে। আত্মারা একে অপরের সাথে ভাই-ভাই সম্পর্ক। দেহ-অভিমানে আসার ফলে, অনেক সম্বন্ধ সম্পর্ক তৈরী হয়। তখন তোমরা ভাই-বোনের সম্পর্কেও আসতে পারো। আত্মিক ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই আর শারীরিক ভাবধারায় তা ভাই-বোন। যেহেতু তখন তোমরা প্রবৃত্তি-মার্গের হয়ে যাও। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই আশীর্ব্বাদী বর্সার প্রয়োজন। যেহেতু পুরুষার্থ করে আত্মারা। নিজেকে আত্মা ভাবাটাই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। যেখানে কোনও দেহ-অভিমান থাকবে না। শরীরের ভাবটাই যদি না থাকে তো, বিকার আসবে কোত্থেকে ? আমি আত্মা-স্বরূপ, বাবার কাছে যেতে হবে -এই স্থিতিতে থাকতে পারলে, শরীরের ভাবটাই আর থাকে না। যত বেশী যোগী হতে থাকবে, কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলি তত বেশী শান্ত হতে থাকবে। আবার যত বেশী দেহ-অভিমানে আসবে, কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলি ততই বেশী চঞ্চল হতে থাকবে। তোমাদের আত্মারা প্রাপ্তিগুলিকে এখন উপলব্ধি করতে পারছে। শরীর থেকে যত বেশী আলাদা হতে পারবে, কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলি তত বেশী শান্ত হতে থাকবে। জাগতিক সন্ন্যাসীরা তো ঔষধি সেবনের দ্বারা কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত রাখে। যা হঠ্ যোগের অন্তর্গত। কিন্তু তোমাদেরকে যোগের দ্বারাই সেই কাজ করতে হবে। তোমরা কি পারবে না, যোগবলের দ্বারা তাকে বশে আনতে। যেমন যেমন তোমরা আত্ম-অভিমানী হতে থাকবে, তেমন তেমন তোমাদের কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিও শান্ত হতে থাকবে। যদিও এটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু প্রাপ্তিটাও যে এতে অনেক উচ্চ-স্তরের। বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, যোগবলের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিকে পরিণত হও। কর্ম-ইন্দ্রিয়ের উপর জিত প্রাপ্ত করতে পারার কারনেই, ভারতের এই যোগের এত খ্যাতি। এর দ্বারাই তোমরা- মনুষ্য থেকে দেবতা, পতিত-পাপী থেকে পবিত্র-পাবন হও। তোমাদের মধ্যে যারা প্রজা হও, তারাও কিন্তু স্বর্গবাসীই হয়ে থাকে। যা কোনও বাহুবলের কাজ নয়। অথচ, পরিশ্রমও এমন বেশী কিছু নয়। আর কুমারী মেয়েদের জন্য তো- ভাববে এটা কোনও পরিশ্রমই নয়। যা অতি সরল ও সহজ। কিন্তু, বিকারের অধীনে গেলেই, তখন কত প্রকারের প্রশ্ন, বিচার, শালিশী ইত্যাদি হয়ে যায়। তাই তো কুমারী থাকাটা কত ভাল। না হলে তো অধর কুমারী নাম হয়ে যাবে। আর কারও যুগলই বা কেন হতে যাবে। তাতেও তো সেই নাম-রূপেরই মোহ অভিমান আসে। আসলে যা মূর্খতারই সামিল। যুগল (দম্পতি) হবার পর, পবিত্রতা রক্ষা করতে গেলে, প্রচুর সাহসী হতে হবে। যার জন্য অনেক উচ্চ-জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। তনেকেই সাহসের ভরে তাতে এগিয়েও যায়, কিন্তু কামাগ্নির আগুনের তাপে- তাদের সেই ব্রত, নষ্টই হয়ে যায়। এই কারণেই বাবা কুমারী অবস্থাকেই বেশী মান্যতা দেন। অতএব অধর-কুমারী হবার ইচ্ছাটা না হওয়াই ভালো। কুমারীদেরই তো নাম উজ্জ্বল হয়। প্রকৃত অর্থে তারাই তো শৈশব অবস্থা থেকেই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্চার এটাই সবচেয়ে ভালো অবস্থা, যার ফলে মানসিক ও শারিরীক বল সঞ্চিত হয়। তখন অন্য কিছু মনে স্থান পায় না। তবে যার সেই অদম্য সাহস আছে, সে তা করে দেখাতেই পারে। যদিও তা যথেষ্টই কষ্টসাধ্য। কারণ, সেই পর্যায়ে তো একসাথে দুজনের ব্যাপার এসে যায়। কুমারী থাকলে সেক্ষেত্রে সে একাই সিদ্ধান্ত নেয়। দুই হলেই তা দ্বৈত্য (একাধিক) হয়ে যায়। তাই তো পারলে কুমারী থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কুমারীরা সেবার কাজে এদিক ওদিকেও যেতে পারবে। আর বন্ধনে আবদ্ধ হলে, সেই বন্ধন আরও বাড়তে থাকে। তাই বন্ধনের পাতা জালে নিজের বুদ্ধিকে কেনই বা ফাঁসিয়ে রাখবে -যেই জালে ফাঁসা উচিত নয় মোটেই। যেখানে কুমারীদের জন্য এত সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কুমারীদের অনেকেই সুনামের অধিকারীও হয়েছে। যার মধ্যে কান্হাইয়ার নাম অনেকেই করে। কুমারী হয়ে থাকতে পারলে খুবই ভাল হয়। এদের জন্য তখন সব কিছুই খুব সহজ হয়। ছাত্র-জীবনই পবিত্র জীবন। বুদ্ধিও তখন সতেজ থাকে। কুমারদেরও ভীষ্ম- পিতামহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। কল্প পূর্বে তো এরকম

ছিলই, যার স্মৃতি স্বরূপ দিলবারা মন্দিরে তা খোঁচিত রয়েছে। তাই বাবা এখন বাচ্চাদেরকে এই আদেশই দিচ্ছেন - ওনাকে স্মরণ করতে। অন্য সব বিষয় ভুলে থেকে, কেবল মাত্র নিজের কল্যাণেই মন দাও। বাবার স্মরণে থাকাটাই বাচ্চাদের কল্যাণ। দোষ-ত্রুটি তো হতেই থাকে, অনেকের পতনও হয়, কিন্তু সেই সব পরচিন্তন ছেড়ে, তোমরা যে যার নিজ কল্যাণে মন দাও। অন্য কোনও চিন্তার মধ্যে ঢুকবেই না। তোমরা নিজেদেরকে খাঁটি সোনায় পরিণত করো আর অন্যদেরকেও সেই দিশা দেখাও। সতোপ্রধান হবার এই একটাই উপায়। পবিত্র হতে না পারলে, মুক্তিধামে পৌঁছতেই পারবে না। উপায় তো এই একটাই, এরপর অন্তিম সময়কালে যে মানসিক অবস্থা থাকবে-আগামীতে তেমনটাই প্রাপ্তি হবে। তাই ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। তাতে কেবল নিজেরই ক্ষতি হয়। এই বাবা কিন্তু কারওকেই কোনও প্রকার অভিশাপ দেন না। শ্রীমত অনুসারে না চলে, সে নিজেই নিজেকে শ্রাপিত করে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ সুমন ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিশ্চয় বুদ্ধিধারী হয়ে, অশরীরী ভাবে এই পুরোনো জাগতিক সংসারে থেকেও, এই জগৎ থেকেই মনকে জগৎ থেকে আলাদা করে রাখার অভ্যাস করতে হবে। বাবার প্রত্যেকটি আদেশকেই পালন করে নিজের কল্যাণ করে যেতে হবে।

২) অপরের বিষয়ে চিন্তন না করে, নিজের বুদ্ধিকে খাঁটি সোনার মতন অবস্থায় আনতে হবে। ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে জড়িয়ে পরে নিজের অমূল্য সময়কে নষ্ট করা চলবে না। যোগবলের দ্বারা নিজের কর্মন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত ও শীতল স্থিতিতে আনতে হবে।

বরদান :- উদ্যম-উৎসাহ আর লক্ষ্যর স্মৃতিকে সামনে রেখে, সব কর্মন্দ্রিয়গুলিকেই ইচ্ছানুসারে প্রয়োগকারী- মুকুটধারী সিংহাসনের অধিকারী হও (ভব)

একমাত্র এই সঙ্গমযুগেই বাপদাদার দ্বারা সকল বাচ্চারই মুকুট আর সিংহাসনের প্রাপ্তি হয়। পবিত্রতার যেমন মুকুট থাকে, তেমনি কর্তব্য কর্মেরও মুকুট থাকে। কারও যেমন অতি সাধারণ মুকুট থাকে, কারও আবার মনের মতন দৃষ্টি-আকর্ষণকারী মুকুটও থাকে। যখন এইরূপ দ্বি-মুকুটধারী আর তার সাথে সিংহাসনের অধিকারী হবার আগ্রহ আর লক্ষ্যের দৃঢ়তা আসবে, স্বাভাবিক ভাবেই তখন সর্বদাই যোগের স্থিতি চলে আসে। ফলে কর্মন্দ্রিয়গুলি আজ্ঞাকারী হয়ে যায়। কিন্তু যারা মুকুট আর সিংহাসনের কথা ভাবে না, তার আজ্ঞা কোনও কিছুতেই কার্যকরী হয় না।

স্লোগান :- দুর্বল সংকল্প প্রসন্নতার বদলে প্রশ্নের উদয় হয় মনে।